গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস পালন

ভূমিকা

বাংলাদেশ নদীমাতৃক কৃষিনির্ভর দেশ। এ দেশের নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওড় পুকুর, ডোবা হাঁস পালনের জন্য উপযোগী। এছাড়াও বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু হাঁস পালনের জন্য অনুকূল। গ্রামবহুল এ দেশে পারিবারিকভাবে হাঁস পালন একটি প্রাচীন প্রথা। অল্প খরচে অধিক মুনাফা অর্জনে হাঁস পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। হাঁস প্রাকৃতিক খাদ্য খেয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্যের অর্ধেকেরও বেশি পুরণ করতে পারে। দেশে প্রচুর খাল-বিল, নদী নালা থাকায় একজন খামারি সামান্য পরিমাণ খাদ্য প্রদান করে সারা বছরই লাভজনকভাবে হাঁস পালন করতে পারেন। প্রাণিজ আমিষের প্রধান প্রধান উৎসের মধ্যে হাঁসের মাংস, মুরগির মাংস ও ডিম অন্যতম। প্রাকৃতিক উৎসের ওপর নির্ভর করে হাঁস পালন করলে উৎপাদন খরচ অনেক কম হবে।

হাঁসের জাত এবং জাতসমূহের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান হাঁস উৎপাদনকারী এলাকাগুলোতে যেমন- নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জের নিচু এলাকা এবং অন্যান্য এলাকায় যেখানে অধিকসংখ্যক হাঁস পালন করা হয়, সে সমস্ত এলাকায় প্রাপ্ত হাঁসের জাত ও তাদের শতকরা হার নিম্নরূপ-

জাত	শতকরা হার
খাকি ক্যাম্পবেল	৪৫
দেশী	৩০
জিন্ডিং	২০
ইন্ডিয়ান রানার	৫

দেশী

দেশী হাঁস নানা প্রতিকূল পরিবেশে ডিম ও মাংস উৎপাদন করে থাকে। বাংলাদেশের দেশী হাঁস উৎপাদন ক্ষমতার বিচারে উৎকৃষ্টমানের হাঁস। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশী জাতের হাঁস থেকে বাছাই ও নির্বাচনের মাধ্যমে দুইটি হাঁসের জাত উদ্ভাবন করেছে। এগুলো



হচ্ছে, বিএলআরআই-১ (নাগেশ্বরী) এবং বিএলআরআই-২ (রূপালী)। এ সমস্ত হাঁসের উৎপাদন ক্ষমতা অন্যান্য বিদেশী ডিম উৎপাদনকারী হাঁসের সমকক্ষ। গবেষণায় দেখা গেছে যে, এ সমস্ত হাঁসের জাতকে উন্নত ব্যবস্থাপনায় আবদ্ধ অবস্থায় পালন করলে ২০০ থেকে ২০৫টি ডিম পাওয়া যেতে পারে।

খাকি ক্যাম্পবেল

ডিম উৎপাদনের জন্য খাকি ক্যাম্পবেল একটি জনপ্রিয় জাত। এ জাত প্রধানত দেশের নিম্নাঞ্চলগুলোতে পালন করা হয়। শারীরিক ওজন হাঁসা ২-২.৫ কেজি এবং হাঁসি ১-১.৫ কেজি। এ জাতীয় হাঁস সাধারণত ১৪১ দিন (২০ সপ্তাহ) বয়সে বয়প্রাপ্ত হয়। প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ১৭৬ গ্রাম। গড়ে বছরে একটি হাঁসি ২৫০-৩০০ টি ডিম পাড়ে। প্রতিটি ডিমের ওজন গড়ে প্রায় ৬৯ গ্রাম।

জিন্ডিং

ডিম উৎপাদনকারী জাতগুলোর মধ্যে জিন্ডিং অন্যতম। এদেরও গড় ওজন হাঁসা ২.০০ কেজি এবং হাঁসি ১.৫ কেজি। সাধারণত ১২৬ দিন বয়সে (১৮ সপ্তাহ) বয়সে বয়:প্রাপ্ত হয়। দৈনিক একটি বয়স্ক হাঁসের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ১৬০ গ্রাম। বছরে ডিম পাড়ে প্রায় ২৭০টি। গড়ে প্রতিটি ডিমের ওজন ৬৮ গ্রাম।

ইন্ডিয়ান রানার

ইন্ডিয়ান রানার একটি ডিম উৎপাদক জাত। এ জাতের তিনটি উপজাত আছে। তার মধ্যে সাদা জাতটি বেশি প্রচলিত। এ জাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ঘাড় শরীরের সঙ্গে সমান্তরাল। দৈহিক ওজন হাঁসা ২-২.৫ কেজি এবং হাঁসি ১-২ কেজি। এ জাতটি ১৪০ দিন (২০ সপ্তাহ) বয়সে প্রথম ডিম পাড়া আরম্ভ করে। গড়ে বছরে একটি হাঁসি ২৫০-৩০০ টি ডিম পাড়ে। প্রতিটি ডিমের ওজন গড়ে প্রায় ৬৬ গ্রাম।

হাঁসের বাচ্চা প্রাপ্তি স্থান

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে হাঁসের বাচ্চা সংগ্রহ করা যেতে পারে। খামারিগণ সরকারি হাঁস-মুরগি খামার থেকেও বাচ্চা পেতে পারেন। তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় হাঁস প্রজনন খামার নারায়ণগঞ্জ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার যেমনঃ দৌলতপুর, নওগাঁ এবং সোনাগাজী থেকেও হাঁসের বাচ্চা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বেসরকারি উদ্যোগেও হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করা হয়। তন্মধ্যে এফআইভিডি (FIVD) এবং গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলা রামভদ্র গ্রামে তুষ পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করা হয়। খামারিরা ইচ্ছা করলে এ সমস্ত এনজিও এবং ব্যক্তি পর্যায়ে উৎপাদিত খামারিদের নিকট থেকেও হাঁসের বাচ্চা ক্রয় করতে পারেন।

হাঁসের বাচ্চার ব্রুডিং কালীন ব্যবস্থাপনা

বাচ্চা ফোটার পর থেকে ৫-৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চার কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ নিশ্চিত করাই হচ্ছে ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা। ব্রুডিংকালে হাঁসের বাচ্চার পর্যাপ্ত যত্ন নিশ্চিত করতে হবে। এ সময় হাঁসের বাচ্চার মৃত্যুহার খুব বেশি। এই সময়ে হাঁসের বাচ্চার তাপ, আদ্রর্তা, আলো, বা চলাচল সঠিক হতে হবে। বাচ্চা পালনের ক্ষেত্রে প্রথম থেকে ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চাকে নিম্নোক্তহারে (সারণি-১) তাপমাত্রা, বায়ু চলাচল ও আলো সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। বাচ্চার ঘর যেন সর্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সারণি : ১ হাঁসের বাচ্চা ব্রুডিংকালে প্রয়োজনীয় কৃত্রিম তাপ, আলো ও বায়ু চলাচল

বয়স (সপ্তাহ)	তাপমাত্রা (০ফা)	আলো প্রদান (ঘণ্টা/দিন)	বায়ু চলাচল
১	৯৫	২০	ঘরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকলে ক্ষতিকর গ্যাস বেরিয়ে যাবে আর্দ্রতা ঠিক থাকবে ও বাচ্চা সুস্থ থাকবে।
২	৯০	১৮	
৩	৮৫	১৪	
৪	৮০	১২	
৫	৭৫	১২	
৬	৭০	১২	

ব্রুডিংকালীন সময়ে প্রয়োজন অনুসারে খাবার পাত্র ও পানির পাত্র সরবরাহ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে খাবার ও পানির পাত্র অবশ্যই তাপের উৎসের কাছাকাছি থেকে একটু দূরে সাজিয়ে রাখতে হবে। এ সময় বাচ্চাগুলোকে নিয়মিত সুষম ও পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করতে হবে। ব্রুডারে বাচ্চার অবস্থান দেখে বুঝা যায় তাপমাত্রা কম বা বেশি আছে কি-না। বাচ্চাগুলোকে তাপ প্রদানের সময় যদি দেখা যায় তারা ছড়ানো ছিটানো থাকে ও সতর্ক মনে হয় তবেই বুঝতে হবে বাচ্চাগুলো সুস্থ অছে। অনেক সময় দেখা যায়, প্রথম কয়েকদিন ঠান্ডা লিটারের সংস্পর্শে এসে বাচ্চার দেহের তাপমাত্রা কমে যায়। এ কারণে বাচ্চা ব্রুডিং রুমে নেয়ার ১২-১৪ ঘণ্টা পূর্ব থেকেই ব্রুডার জ্বালিয়ে ঘর গরম করে রাখতে হয়, যেন বাচ্চা রাখার সময় লিটারের তাপমাত্রা ২৮° সেঃ থেকে ৩১° সেঃ এর মধ্যে থাকে। ব্রুডিং সময়ে তাপমাত্রা উঠানামা করলে কিংবা পর্যাপ্ত তাপমাত্রার ব্যবস্থা না থাকলে বাচ্চা ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে এবং বাচ্চার মৃত্যুর হার অধিক হতে পারে। এজন্য ব্রুডিংকালীন সময়ে সঠিক ব্যবস্থাপনা করলে বাচ্চার মৃত্যুর হার কম হবে এবং পরবর্তীতে এ সমস্ত হাঁস থেকে অধিক ডিম উৎপাদন সম্ভব হবে।

হাঁসের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

গ্রামাঞ্চলে হাঁস অর্ধ আবদ্ধ পদ্ধতিতে পালন করা হয়। পুকুর, খাল-বিল, নদী ইত্যাদিতে হাঁস চড়ে বেড়ায় এবং এখান থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে। এই সমস্ত এলাকায় খাদ্য প্রাপ্তির ওপর (যেমন: শামুক, ঝিনুক ও অন্যান্য জলজ প্রাণী) তাদের উৎপাদন নির্ভর করে। অনেক খামারি চড়ে খাওয়ানোর পাশাপাশি চালের কুঁড়া, চাল ভাঙা, গম ভাঙা, ইত্যাদি খেতে দেয়। এছাড়া দেখা গেছে, যে সমস্ত খামারিদের সুষম খাবার তৈরি ও খাওয়ানো পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই। ফলে পরবর্তীতে হাঁসের ডিম উৎপাদন কম হয়। এ কারণেই খামারিদের জন্য হাঁসের খাদ্য সূত্র সারণি-২ এ নমুনা হিসেবে প্রদান করা হলো। নিম্নোক্ত খাদ্যগুলো পরিমাণগত ক্রমানুসারে একত্র করে খুব ভালোভাবে মিশ্রিত করে হাঁসকে সরবরাহ করলে হাঁস তার চাহিদামতো পুষ্টিমান পাবে। সাধারণত বর্ষা মৌসুমে হাঁসের বাচ্চাগুলোকে অর্ধছাড়া অবস্থায় পালন করলে সম্পূরক খাদ্য হিসেবে বাচ্চা প্রতি ৪০ গ্রাম এবং বয়স্কগুলোকে ৬০ গ্রাম হারে সুষম খাদ্য দিতে হবে। তবে শুষ্ক মৌসুমে প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা কমে যায় বিধায় এ সময় ছেড়ে খাওয়ানোর পাশাপাশি ৭০ থেকে ৮০ গ্রাম খাদ্য সরবরাহ করা দরকার। প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততার ওপর ভিত্তি করে অর্ধছাড়া অবস্থায় হাঁস পালনের জন্য সম্পূরক খাবারের পরিমাণ কম বা বেশি হতে পারে।

সারণি : ২ বিভিন্ন বয়সের হাঁসের খাদ্য তৈরির সূত্র

খাদ্য উপাদান (%)	হাঁসের বাচ্চা (০-৬ সপ্তাহ)	বাড়ন্ত হাঁস (৭-১৯ সপ্তাহ)	ডিমপাড়া হাঁস (২০ সপ্তাহ ও তদুর্দ্ধ)
গম ভাঙা	৩৬.০০	৩৮.০০	৩৬.০০
ভুট্টা ভাঙা	১৮.০০	১৮.০০	১৬.০০
চালের কুঁড়া	১৮.০০	১৭.০০	১৭.০০
সয়াবিন মিল	২২.০০	২৩.০০	২৩.০০
প্রোটিন কনসেনট্রেট	২.০০	২.০০	২.০০
ঝিনুক চূর্ণ	২.০০	২.০০	৩.৫০
ডিসিপি	১.২৫	১.২৫	০.৭৫
ভিটামিন খনিজ মিশ্রিত	০.২৫	০.২৫	০.২৫
লাইসিন	০.১০	০.১০	০.১০
মিথিওনিন	০.১০	০.১০	০.১০
লবণ	০.৩০	০.৩০	০.৩০
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

হাঁসের খাদ্য তৈরির সময় যে সমস্ত খাদ্য উপাদান ব্যবহার করা হবে সেগুলো ফাঙ্গাসযুক্ত আছে কি না তা যাচাই করে দেখতে হবে।

হাঁস পালন পদ্ধতি

নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে হাঁস পালন করা যায়।

১. আবদ্ধ পদ্ধতি
২. অর্ধ আবদ্ধ পদ্ধতি
৩. মুক্ত রেঞ্জ পদ্ধতি
৪. হারডিং পদ্ধতি
৫. ল্যানটিং পদ্ধতি

আবদ্ধ পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে পুরোপুরি হাঁসগুলোকে ঘরের মধ্যে রেখে লালন পালন করা হয়। কোনো অবস্থাতেই হাঁসগুলোকে বাইরে যেতে দেয়া হয় না। এই পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চা (৪-৬) সপ্তাহ পর্যন্ত লালন পালন করা সুবিধাজনক। এই পদ্ধতি ৩ প্রকার

১. ফ্লোরে লালন পালন,
২. খাঁচায় লালন পালন,
৩. তারের জালের মেঝেতে হাঁস পালন।

মেঝেতে হাঁস পালনঃ

এই পদ্ধতিতে মেঝেতে লিটার দ্রব্য দিয়ে হাঁস রাখা হয়। মেঝের ৪ ভাগের এক ভাগ খাবার ও পানি দেয়ার জন্য রাখা হয়, বাকি অংশে হাঁস অবস্থান করে। এই পদ্ধতিতে হাঁস পালনের জন্য অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য ছোট আকারের নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সুবিধা

১. হাঁসগুলোকে ভালোভাবে পরিচর্যা করা যায়,
২. খরচ কম লাগে,
৩. শ্রমিক কম লাগে।

অসুবিধা

১. লিটার দ্রব্য যেগুলো ঘরে বিছানো হয় তা তাড়াতাড়ি পরিবর্তন করতে হয়,
২. হাঁসগুলো এক জায়গায় জড়ো হয়ে থাকার কারণে বাচ্চা হাঁস বের করা কঠিন হয়ে পড়ে,
৩. লিটার দ্রব্যের সাথে খাদ্য দ্রব্য ও পানি দিলে বাসস্থান স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যায় তাই বাসস্থান সহজেই কলুষিত হয়।

খাঁচায় হাঁস পালন

এই পদ্ধতিতে খাঁচাগুলো একটির পর একটি স্তরে স্তরে সাজানো থাকে। খাঁচায় অনেক হাঁস এক সাথে পালন করা যায়। এই পদ্ধতি সাধারণত ২-৩ সপ্তাহ হাঁসের বাচ্চার জন্য উপযুক্ত। প্রতিটি খাঁচায় ২০-২৫ টি বাচ্চা রাখা যায়। হাঁসের বাচ্চাগুলোকে ৩-৪ সপ্তাহের বেশি রাখলে এদের বৃদ্ধি কমে যায়। খাঁচায় হাঁস পালনপালন করলে প্রতিটি হাঁসের জন্য ১.৫ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয়।

সুবিধা

১. এই পদ্ধতিতে বাচ্চা হাঁস পালন করা সহজ,
২. অনেকগুলো এক সাথে পালন করা যায়,
৩. সহজে বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করা যায়।

অসুবিধা

১. এই পদ্ধতিতে বড় হাঁস পালন করা যায় না।

তারের জালের মেঝেতে হাঁস পালন

এ পদ্ধতিতে ঘরের মেঝ থেকে উঁচু করে তারের জাল দেয়া হয় এবং তার জালের ফাঁক যাতে ১/২ বর্গ ইঞ্চি ছিদ্রের বেশি না হয়। মাঁচা র চারপাশে ১-২ ফিট বেড়া দিতে হবে যেন হাঁসের বাচ্চা পড়ে না যায়। মেঝে পদ্ধতিতে প্রতিটি হাঁস পালনের জন্য যে জায়গা লাগে তার চেয়ে তার জালের পদ্ধতিতে হাঁস পালনের জন্য ১/৩-১/২ পরিমাণ জায়গা কম লাগে। এই পদ্ধতিতে হাঁস পালন করলে প্রাথমিক খরচ একটু বেশি হয়।

অসুবিধা

১. তারের জাল বাবদ খরচ বেশি হয়,
২. সাধারণত বেশি বয়স্ক হাঁস পালন করা যায় না।

অর্ধছাড়া পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে রাতে হাঁসগুলোকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হয় এবং দিনের বেলায় ঘরের সামনে চারণ অংশে ছেড়ে দেয়া হয়। অর্ধছাড়া অবস্থায় হাঁস পালনের জন্য খাদ্য ঘরের ভিতরে অথবা চারণ অংশে দেয়া যেতে পারে। তবে চারণ অংশে খাদ্য ও পানি সরবরাহ করা সুবিধাজনক। এই পদ্ধতিতে ঘরের প্রস্থ ১৮-২০ ফুট এবং দৈর্ঘ্য হাঁসের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে দেয়া হয়। চারণ অংশ ঘরের তুলনায় বেশি বড় রাখতে হবে। অর্ধ ছাড়া পদ্ধতিতে হাঁস পালনের জন্য ঘরের সাথে একটি পানির চৌবাচ্চা তৈরি করা যেতে পারে। যার প্রস্থ ২৮ এবং গভীরতা ৬-৮ যাতে হাঁসগুলো সহজে পানি খেতে এবং ভাসতে পারে। এই পদ্ধতিতে একটি হাঁসের জন্য ১০-১২ বর্গফুট চারণ ভূমি দরকার। অর্ধছাড়া অবস্থায় হাঁস পালন করলে ঘরের মেঝে সব সময় শুকনা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

সুবিধা

১. বাণিজ্যিকভিত্তিতে হাঁস পালনের জন্য সুবিধাজনক,
২. হাঁসের যত্ন নেয়া সহজ।

অসুবিধা

১. খরচ বেশি হয়,
২. বন্য প্রাণীর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ছাড়া অবস্থায় হাঁস পালন

এই পদ্ধতিতে হাঁসকে কেবল মাত্র রাতের বেলায় ঘরের মধ্যে আটকিয়ে রাখা হয় এবং দিনের বেলায় বিভিন্ন জায়গায় যেমন- পুকুর, নদী-নালা, হাওর, বিল প্রভৃতি জায়গায় ছড়ানো হয়। এই পদ্ধতিতে বাড়ন্ত এবং পূর্ণ বয়স্ক উভয় প্রকার হাঁসই পালন করা হয়ে থাকে। ছাড়া অবস্থায় হাঁস পালন পদ্ধতিতে হাঁসগুলোকে সকাল ৯ টা পর্যন্ত ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়। এতে ডিম সংগ্রহ করা সুবিধাজনক। ছাড়া অবস্থায় হাঁস পালনের ক্ষেত্রে একটি পূর্ণ বয়স্ক হাঁসের রাতে অবস্থানের জন্য ৩ বর্গফুট জায়গা দরকার এবং বাড়ন্ত হাঁসের জন্য ২ বর্গফুট জায়গা দরকার।

সুবিধা

১. খাদ্য বাবদ খরচ কম লাগে,
২. ব্যবস্থাপনায় কম শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

অসুবিধা

১. বাচ্চা হাঁস পালন করা যায় না,
২. হাঁসগুলোকে বিভিন্ন প্রিডেটর (বন্য প্রাণী) খেয়ে ফেলতে পারে।

হারডিং পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে বাড়ন্ত এবং পূর্ণ বয়স্ক হাঁস একই সাথে পালন করা যায়। হার্ডিং পদ্ধতিতে হাঁস গুলোকে কোনো প্রকার ঘরে রাখা হয় না। হাঁসগুলোকে সাধারণত গতিশীল রাখা হয়। যে সমস্ত জায়গায় প্রাকৃতিক খাবার আছে সে সকল এলাকায় হাঁসগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয়। সারাদিন চরে বেড়ানোর পর রাতের বেলায় হাঁসগুলোকে কোনো একটা উঁচু জায়গায় আটকিয়ে রাখা হয় সকাল পর্যন্ত। কোন নির্দিষ্ট জায়গায় কিছুদিন চরে খাওয়ানোর পর অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়।

এই পদ্ধতিতে এক সাথে একজন লোক ১০০ থেকে ৫০০টি হাঁস চড়াতে পারে। এই পদ্ধতিতে ডিম উৎপাদনের হার ৪৫-৪৮%। এদের ডিম উৎপাদন কম হলেও খাবার খরচ কম হয় বলে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক।

সুবিধা

১. খাবার খরচ কম হয়,
২. বেশি সংখ্যক হাঁস পালন করা সম্ভব।

অসুবিধা

১. ডিম উৎপাদন কম হয়।

ল্যানটিং পদ্ধতি

ল্যানটিং পদ্ধতিতে বড় বড় বিল, হাওড়, জলাশয় এর আশপাশে ঘর তৈরি করে হাঁস পালন করা হয়। হাঁসগুলো দিনের বেলায় বিল বা জলাশয়ে চরে বেড়ানোর পর রাতের বেলায় ঘরে রাখা হয়। এই পদ্ধতিতে একটি ঝাঁকে ১০০ থেকে ২০০টি হাঁস পালন করা যায়।

সুবিধা

১. এদের ডিম উৎপাদন ক্ষমতা ৯০ শতাংশ,
২. খাবার খরচ কম লাগে।

অসুবিধা

১. বাচ্চা হাঁস পালন করা যায় না,
২. কিছু অতিরিক্ত খাদ্য সরবরাহ করতে হয়।

হাঁসের বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

বাসস্থান

হাঁস খুব বেশি গরম ও খুব ঠান্ডা সহ্য করতে পারেনা। হাঁসের ঘর এলাকাভিত্তিক উপকরণের ওপর ভিত্তি করে নির্মাণ করা উচিত। হাঁসের ঘর নির্মাণের সময় সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার-

১. স্থান নির্বাচন : হাঁসের ঘরের জন্য সাধারণত খোলামেলা উচু ও রৌদ্র থাকে এমন জায়গা নির্বাচন করা উচিত। ড্রেন কাটার সুবিধা আছে এবং ঘাস জন্মাতে পারে এমন স্থান নির্ধারণ করা উচিত। ঘরের আশপাশে গাছ বা জঙ্গল থাকা ঠিক নয়। হাঁসের ঘরের স্থান মুরগির খামারের পাশে ঠিক করা উচিত নয়।
২. হাঁসের সংখ্যা এবং কী ধরনের ঘরে হাঁস পালন করা হবে তা বিবেচনা করে ঘর তৈরি করতে হবে। গ্রামীণ পরিবেশ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে ঘরের চালা নির্বাচন করতে হবে।

নিম্নে কতগুলো ঘরের চালার নমুনা দেয়া হলো ঃ

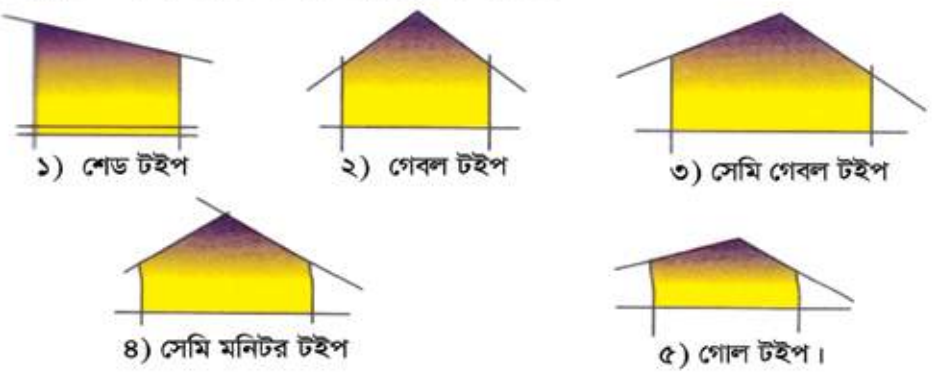

হাঁসের ঘরের ব্যবস্থাপনা

তাপমাত্রা: হাঁসের জন্য অতিরিক্ত গরম ও অতিরিক্ত ঠান্ডা দুটিই ক্ষতিকর। ঘরের তাপমাত্রা সাধারণত ১১.৮ ডিগ্রি সেঃ বা ৫৫ ডিগ্রি ফাঃ থেকে ২৩.৯ ডিগ্রি সেঃ বা ৭৫ ডিগ্রি ফাঃ পর্যন্ত রাখাই সর্বোত্তম।

আর্দ্রতা: হাঁসের ঘরের আর্দ্রতা ৭০% থাকাই বাঞ্ছনীয়। অনুকূল পরিবেশ এবং আবহাওয়ায় হাঁসের লোম গজানো, শারীরিক বৃদ্ধি এবং ডিম উৎপাদন ভালো হয়। ঘরের আর্দ্রতা ৭০% এর বেশি হলে ককসিডিয়া ও কৃমি দেখা দিতে পারে। ঘরের লিটার শুকনা রাখা এবং বায়ু চলাচলের পর্যাপ্ত সুবিধা রাখলে এসব রোগের প্রাদুর্ভাব কম হয়।

আলো: হাঁসের ডিম উৎপাদন ভালো পাওয়ার জন্য আলোর ভূমিকা অপরিসীম। প্রথম ৬ সপ্তাহে রাতে আলোর ব্যবস্থা রাখা হলে খাদ্য বেশি খাবে এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পাবে। ডিমপাড়া হাঁসের জন্য ১৪-১৬ ঘণ্টা আলো থাকা দরকার। দিনের আলোর দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে অতিরিক্ত আলো কৃত্রিম বাল্বের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হবে। ব্রয়লার হাঁস উৎপাদনের জন্য রাতে এবং দিনে আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

বাতাস চলাচল ব্যবস্থা (ভেনটিলেশন): হাঁসের ঘরে বাতাস চলাচল ব্যবস্থা খুবই জরুরি। ঘরের বেড়া তারের জালের বা বাশের তৈরি ছিদ্রওয়ালা হলে আলো বাতাস চলাচলে সুবিধা হয়।

মেঝে এবং মেঝের পরিমাপ : মেঝে অবশ্যই শুকনা হতে হবে এবং মেঝেতে কোনো প্রকার গর্ত থাকা চলবে না। ১-২ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার জন্য ১/২ বর্গফুট, ৩-৪ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার জন্য ১ বর্গফুট এবং ৫-৭ সপ্তাহ ও এর ওপরের বয়সের হাঁসের জন্য ২ বর্গফুট জায়গার দরকার।

খাবার ও পানির পাত্র: হাঁসের ঘরে পানির জন্য ওয়াটার চেনেল তৈরি করতে হবে যার প্রস্থ ২০" এবং গভীর ৮-৯" হবে। ওয়াটার চেনেলের পানি অপরিষ্কার হলে তা বের করে পরিষ্কার পানি দিতে হবে। পানির কাছে খাবারের পাত্রে খাবার দিতে হবে।

হাঁসের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

হাঁস পালন মুরগির তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ। হাঁসের দুইটি মারাত্মক রোগ হলো ডাক প্লেগ ও ডাক কলেরা। সারণি-৩ এ বর্ণিত টিকা দান কর্মসূচি নিয়মিত অনুসরণ করলে হাঁসের রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। এছাড়া আজকাল খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত রোগ যেমন আফলাটক্সিন ও বটুলিজমের কারণে হাঁসের মৃত্যু ঘটতে দেখা যাচ্ছে। কাজেই খাদ্য তৈরির সময় বিশেষ করে ভুট্টাবীজ খুব ভালোভাবে নির্বাচনপূর্বক অন্যান্য খাদ্য উপাদান সঠিকভাবে নির্বাচন করে খাদ্য তৈরি করলে এ সমস্যা এড়ানো সম্ভব।

সারণি- ৩ : হাঁসের রোগ প্রতিরোধক টিকা দান কর্মসূচি

রোগের নাম	টিকার নাম	প্রাপ্তি স্থান	প্রয়োগের বয়স	প্রয়োগ পদ্ধতি
ডাক প্লেগ	ডাক প্লেগ টীকা	দেশের সকল প্রাণী চিকিৎসালয়	প্রথম মাত্রা ২১-২৮ দিন বয়সে দ্বিতীয় মাত্রা (বুস্টার ডোজ) ১ম মাত্রার ১৫ দিন পর অর্থাৎ ৩৬-৪৩ দিন বয়সে পরবর্তী প্রতি ৪-৫ মাস পর পর একবার	বুকের মাংসে/ প্রয়োগ বিধিমতে
ডাক কলেরা	ডাক কলেরা টীকা	দেশের সকল প্রাণী চিকিৎসালয়	প্রথম মাত্রা ৪৫-৬০ দিন বয়সে দ্বিতীয় মাত্রা (বুস্টার ডোজ) ১ম মাত্রার ১৫ দিন পর অর্থাৎ ৬০-৭৫ দিন বয়সে পরবর্তী প্রতি ৪-৫ মাস পর পর একবার	ডানার তলদেশে পালক ও শিরাহীন স্থানে চামড়ার নিচে/ প্রয়োগ বিধিমতে ডানার তলদেশে পালক ও শিরাহীন স্থানে

বিঃ দ্রঃ প্রতিষেধক টিকা প্রস্তুতকারীর নির্দেশ মোতাবেক প্রয়োগ করা উচিত

উপসংহার

বাংলাদেশের বিভিন্ন এগ্রো-ইকোলজিক্যাল এলাকায় অঞ্চলভিত্তিক খামারিরা হাঁস পালন করে আসছে। এ সমস্ত খামারিদের অধিকাংশই বিজ্ঞানভিত্তিক হাঁস পালন সম্পর্কে ধারণা অত্যন্ত সীমিত। হাঁস পালনের ক্ষেত্রে খামারিদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব। হাঁস পালনের বিজ্ঞানভিত্তিক দক্ষতা খামারিদের দারিদ্র্যবিমোচনে, পুষ্টি চাহিদা পূরণে, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের ব্রয়লার ও লেয়ার শিল্পের পাশাপাশি গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস পালনের ওপর সরকারের নীতি নির্ধারকগণ দৃষ্টি প্রদান করলে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি, পুষ্টি অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

প্যাকেজের উদ্ভাবক

ড. কাজী মোঃ ইমদাদুল হক, মোঃ জাহিদ হোসেন, ড. মোঃ সাজেদুল করিম সরকার
ড. মোঃ সালাহ উদ্দিন এবং ড. মোঃ নজরুল ইসলাম